COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

ভারত তথা বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের সূচনা।

ব্রাহ্মণজনগোষ্ঠী ভারতের ভূমি সন্তান নয়। এরা আর্য। আর্যরা ভারতের ভূমি সন্তান নয়- বহিরাগত। তারা অভাব দারিদ্র্য খাদ্য সংকট প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা যুদ্ধজনিত কারণে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। আর্যদের আগমন সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণা হল, খৃষ্টপূর্ব ৩ হাজার বছরের দিকে মধ্য অথবা পূর্ব ইউরোপের অংশে অথবা রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালার সমতল ভূভাগে ইন্দো ইউরোপীয় অথবা আর্য জাতির উদ্ভব হয়। অত্যধিক শীতের জন্য হোক অথবা অন্য জাতির আক্রমণের ফলেই হোক এ আর্যরা পিতৃভূমি হতে দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সভ্যতার দিক দিয়ে এরা খুব উন্নত ছিল এমনটি নয়। এ ব্যাপারে শ্রী অমিত কুমার বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'খৃস্টের জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কাছে আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল ভিল সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক প্রধান সুসভ্য জাতি বাস করিত।' এই দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের ভূমি সন্তান। এদেশে আগমনের পর দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত শুরু হয়। পর দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্যদের সংগ্রাম শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যদের সাথে দ্রাবিড়দের সংঘাত অব্যাহত থাকে। দূর দেশ থেকে ভয়সংকুল পথ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সংকটের মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল অর্জন করে আর্যরা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিগত সংকটের কারণে তারা দক্ষতার সাথে দ্রাবিড়দের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে তারা ভূমি সন্তান দ্রাবিড়দের উপর বিজয়ী হয়। কালক্রমে দ্রাবিড়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যরা রপ্ত করে নেয়। দুই সভ্যতার মিশ্রণে নতুন সাংস্কৃতিক ধারা এবং ধর্মীয় অনুভবের সূচনা হয়। ওদিকে পরাজিত দ্রাবিড়রা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় অথবা আর্যদের অধীনে লাঞ্ছিত হতে থাকে। আর্যরা পরাজিত দ্রাবিড়দের ওপর তাদের নির্দেশনা চাপিয়ে দেয়। আর্যদের প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্ন স্তরে দ্রাবিড়দের স্থান দেয়া

হয়। পিরামিডের শীর্ষে স্থান নেয় আর্যরা। সর্ব নিম্নে অবস্থান হয় দ্রাবিড়দের। শীর্ষে থাকা এই আর্য থেকেই জন্মলাভ করে ব্রাহ্মণ্যবাদ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা লক্ষ করেছিলেন, 'আর্য'রা পূর্ব ভারতে কিছুটা দেরিতে পৌঁছেছিল এবং তাদের অগ্রগতি স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধ করেছিল। বাংলা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কিন্তু প্রক্রিয়াটি খুব সহজ হয়নি।

মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্রাহ্মণ্য অধিবাসীরা ক্রমশ পূর্বদেশের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, রঘু, কর্ণ ও ভীমের বিজয় অভিযানের কাহিনিতে তার পরিচয় আছে। রামায়ণ অনুযায়ী মৎস্য, কাশী ও কোশলের রাজপরিবারগুলি অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন শুরু করেছিল। আরও ইঙ্গিতপূর্ণ কাহিনিটি পাওয়া যায় বায়ু ও মৎস্য পুরাণে। ঋষি দীর্ঘতমস অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাদের নাম হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুক্ষ্ম। কাহিনি অনুযায়ী যে পাঁচটি জনপদ এই নামে পরিচিত, সেগুলি দীর্ঘতমসের সন্তানদের নাম থেকেই গৃহীত।

দেখা যাচ্ছে, বাংলা ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল এবং ব্রাহ্মণ্য বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছিল। ধর্মসূত্রগুলি রচনাকালে আর্যাবর্তের পূর্ব সীমা ছিল প্রয়াগ; মানব ধর্মশাস্ত্র রচনার সময় তা পূর্ব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। মনু পৌন্ড্রদের পতিত ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মহাভারতে বঙ্গ ও পৌন্ড্রদের এবং মৎস্য ও বায়ু পুরাণে বঙ্গ, সুক্ষ্ম ও পৌন্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্রাহ্মণ বলেও স্বীকৃত হচ্ছিল। সুতরাং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের অগ্রগতি একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

গুপ্তোত্তর যুগ থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসারের প্রক্রিয়াটি আরও গতি পায়। ব্রাহ্মণরা নিয়মিত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন, শাসনবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন, বিশেষ সামাজিক সুবিধা ভোগ করতেন। ব্রাহ্মণরা বাংলায় যে শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন, যেমন বাংলার প্রাচীন পুরাণগুলি, তা এই সময়ই আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থগুলিতেই প্রথম বাঙালির সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং ধর্মীয় বিধি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিল, তারা যে বাংলায় সপ্তম

শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধদের থেকে সংখ্যায় বেশি হয়ে গিয়েছিল, চৈনিক পরিব্রাজক জুয়ান ঝাং (হিউয়েন সাঙ)-এর সাক্ষ্য থেকে তা জানা যায়।

বস্তুত ভূমিদান সংক্রান্ত লেখগুলি থেকে মনে হয়, পালযুগ থেকেই বাংলার রাজারা বৈদিক ভাবধারা ও আচার-অনুষ্ঠানের পোষকতা করছিলেন। কাম্বোজ-রাজ নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসনে তাঁর রাজধানী প্রিয়ঙ্গুর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে দেখি, যজ্ঞে আহুতিরূপে নিক্ষিপ্ত পূণাসীর ধোঁয়ার সঙ্গে উপরে উঠে প্রিয়ঙ্গুর আকাশকে মেঘের মতো আচ্ছাদিত করে রাখত। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লেখ-এ দাবি করা হয়েছে, রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামের সৌন্দর্য বেদের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে রাঢ়দেশের সামন্তসেনের সময়কার একটি আশ্রমের বর্ণনা আছে। সেখানে দেখি, ঋষিরা নিয়মিত যে সব যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, তা থেকে নিঃসৃত সুগন্ধ বাতাসকে পরিশুদ্ধ রাখত, হরিণশিশু ঋষিপত্নীদের স্তন্যপান করত, শুকপাখি বেদের স্তোত্র আবৃত্তি করত। এ সব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাকে 'বৈদিক সংস্কৃতির একটি সুরক্ষিত আশ্রয়' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথম যে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল তারা খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারত থেকে এসেছিল। সমসাময়িক লেখগুলি থেকে জানা যায়, মধ্যদেশ থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণদের অভিপ্রয়াণের এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং অষ্টম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রাহ্মণরা উত্তর ভারতের নানা প্রদেশ, এমনকী গুজরাতের লাট অঞ্চলের মতো দূর দেশ থেকেও আসত। পাল রাজারা যে এই সব ব্রাহ্মণদের শাসনবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন তা থেকে মনে হয়, বহিরাগত ব্রাহ্মণরা সমাজে বেশি মাননীয় বলে গণ্য হত। ব্রাহ্মণ অভিপ্রয়াণের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাই প্রমাণ করে, তারা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করত। না হলে তারা জমির অনুদান এবং এত সম্মান ও সুযোগ-সুবিধার প্রাপক হতে পারত না। এই সব তথ্যই সেই সামূহিক স্মৃতিভাণ্ডার নির্মাণে সাহায্য করেছিল, যার কল্পরূপ মধ্যযুগের শেষ ভাগে রচিত কুলজি গ্রন্থগুলিতে প্রকাশ পায়।

আদিশূরের কাহিনি বাংলার সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন, কেন না এই বঙ্গভূমিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই অন্তবর্তী বর্ণ দুটি কখনও ছিল না। প্রথম অভিবাসী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী বাংলার সমস্ত স্থানীয় অধিবাসীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন— সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র। আদিশূরের কাহিনিতে সেন

যুগের যে উল্লেখ আছে, তা সেই অস্পষ্ট কালসীমার মধ্যে পড়ে যেখানে বস্তুগত ইতিহাস ও কল্প-ইতিহাস জড়িয়ে যায় এবং পরস্পরের অবলম্বন হয়ে ওঠে। শেষ-মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক বিন্যাসের যে পুনর্গঠন হয়েছিল তা প্রমাণভিত্তিক ইতিহাস এবং সামূহিক স্মৃতি— এ দুইয়ের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ কুলজিগুলিতে কল্প-ইতিহাসের মোড়কে এই পুরো ইতিহাসটাই ধরা আছে।

সর্বোপরি, কুলজি গ্রন্থগুলি একটি জরুরি তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার পুরাণগুলি স্বীকার না করলেও, ব্রাহ্মণরা যে সকলেই এক অভিন্ন শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না, কুলজিগুলি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ— এঁরা আবার কুলীন ও ভঙ্গ— এই দুই ভাগে বিভক্ত, শ্রোত্রিয় ও বৈদিক ব্রাহ্মণ, সপ্তশতী, মধ্যশ্রেণী, গৌড়ীয় ও বঙ্গজ ব্রাহ্মণ, গ্রহ-বিপ্র,বর্ণ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ— এদের অসংখ্য উপভেদ এবং গোত্র, প্রবর, চরণ, শাখা, মেল, গাঞী ও আরও নানা বিভাগ— যদিও সকলেই ব্রাহ্মণ বন্ধনীভুক্ত। এদের অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস এমনই সুদৃঢ় ও অনমনীয় ছিল যে, উঁচু থাকের কোনও ব্রাহ্মণ অগ্রদানীর মতো নিচু থাকের ব্রাহ্মণের কাছে জল পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। বিবাহের ব্যাপারেও অনুরূপ বাধানিষেধ ছিল। বাংলার ব্রাহ্মণদের এই বিভিন্নতা পুরাণগুলি গোপন রাখতে চেষ্টা করলেও এ সম্পর্কে যে তারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না সেটা বললে ভুল হয়।